প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ ১৩৬৭
ডিসেম্বর, ১৯৬০
প্রকাশিকা
অরুণা বাগচী
অরুণা প্রকাশনী
৭ যুগলকিশোর দাস লেন
কলকাতা ৬
প্রচ্ছদপট
পূর্ণেন্দু পত্রী
মুদ্রক
দুর্গাপদ ঘোষ
শ্রীঅরবিন্দ প্রেস
১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা ৬

পূরবীকে, তার সাহসের জন্য

এই লেখকের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ

নীল নির্জন

অন্ধকার বারান্দা

প্রথম নায়ক

নীরক্ত করবী

নক্ষত্র জয়ের জন্য

কলকাতার যীশু

শ্রেষ্ঠ কবিতা

উলঙ্গ রাজা

ছন্দ-আলোচনা

কবিতার ক্লাস

সূচীপত্র

তুমি মানুষটা

তুমি মানুষটা ক্রমেই তোমার জামাকাপড়ের তুলনায়
বড় হয়ে যাচ্ছ।
তুমি মানুষটা ক্রমেই আরও বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াচ্ছ
আমাদের পক্ষে।
আমরা তোমাকে একটা খাঁচা বানিয়ে দিয়েছিলুম।
তুমি সেই খাঁচার শিকে
কপাল ফাটিয়ে মাথা ঠুকতে, আর
আমরা দেখতুম।
আজ দেখছি,
খাঁচার মধ্যে তোমাকে আর
আঁটানো যাচ্ছে না।
তুমি মানুষটা হঠাৎ আমাদের জীবনে একটা
নতুন রকমের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছ।

তুমি মানুষটা কী চাও, আমরা বুঝি না।
আমরা যখন তোমার খাঁচার সামনে গিয়ে দাঁড়াই,
তখন তুমি অন্য দিকে তাকিয়ে থাকো।
অথচ
পিছন ফিরবামাত্র মনে হয়,
তোমার দুই খর চক্ষু আমাদের অনুসরণ করে বেড়াচ্ছে।
আমাদের পিঠ তখন শিরশির করে ;
আমাদের মেরুদণ্ড তখন
নিমেষে কেমন তরল হয়ে যায়।
তক্ষুনি আবার সম্পূর্ণ ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখি,
তুমি সেই আগের মতই অন্য দিকে তাকিয়ে আছ।
উদাসীন ও নির্বিকার।
অথচ একটু আগেই তো তুমি দুই চোখে আগুন জেলে
আমাদের দেখছিলে। তাই না ?

তুমি মানুষটা এতদিন আমাদের দ্রষ্টব্য ছিলে।
এখন তুমিই তোমার দৃষ্টির ফাঁদে
আটকে রেখেছ আমাদের।
আমরা তোমার নজরবন্দী হয়ে বুঝতে পারছি,
জামাকাপড়ের তুলনায় তোমার শরীর ক্রমেই
বড় হয়ে যাচ্ছে।
বুঝতে পারছি,
লোহার শক্ত ছাত ফাটিয়ে, হাত বাড়িয়ে
আকাশটাকে না-ছোঁয়া পর্যন্ত তুমি
শান্ত হবে না।
মনে হচ্ছে,
তুমি মানুষটা ক্রমেই যেন…ক্রমেই যেন
মানুষ হয়ে উঠছ।

অন্নের তৃতীয় ভাগ

ক্ষুধার অন্নকে তুমি তিনভাগ করে দিয়েছিলে।
একভাগ হারিয়ে ফেলেছি।
জানি না, কোথায় হারিয়েছি।
এখন বেড়াই খুঁজে জলে, স্থলে, আকাশের নীলে।

অন্নকে জেনেছি ব্রহ্ম, দুইভাগ ব্রহ্ম আমি নিয়েছি জঠরে।
একভাগ জমা ছিল ঘরে।
এখন নিজের সঙ্গে দিবারাত্রি যুঝি ;
যা ছিল ঘরের মধ্যে, চৌকাঠ পেরিয়ে তাকে খুঁজি
সমস্ত নিখিলে।
ক্ষুধার অন্নকে তুমি এক, দুই, তিনভাগ করে দিয়েছিলে।

এই মুহূর্তে

যারা আমার অনেক দিনের, অনেক কালের চেনা মানুষ,
এখন আমি
তাদেরও আর
স্পষ্ট করে চিনে উঠতে পারি না।
আকাশ থেকে আলো এখনও মিলিয়ে যায়নি,
তবু, এরই মধ্যে,
তারা কেমন ঝাপসা হয়ে গেল।

দোষ কি আমার চোখের ?
আশৈশব দেখছি এমন চেনা লোকের
কথাই বা ঠিক বুঝতে পারি কই ?
মুখের সামনে গামছা ঘুরিয়ে
কেউ যখন বলে
'বড় তিয়াস গো বাবু', আমি তখনও একটু
ইতস্তত করি।

অর্থাৎ আমি বুঝতে পারি না,
'তিয়াস' বলতে লোকটা আজকে, এই মুহূর্তে
ঠিক কোন রকমের তেষ্টার কথা
বোঝাতে চাইছে।

এ কেমন বিদ্যাসাগর

আমার শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের দিনগুলি আজ
হাজার টুকরো হয়ে
হাজার জায়গায় ছড়িয়ে আছে।
আমার বালিকাবয়সী কন্যা যেমন
নতজানু হয়ে
তার ছিন্ন মালার ভ্রষ্ট পুঁতিগুলিকে
একটি-একটি করে কুড়িয়ে নেয়,
আমিও তেমনি
আমার ছত্রখান সেই বিগত-জীবনের হৃৎপ্রদেশে
নতজানু হয়ে বসি,
এবং নতুন করে আবার মালা গাঁথার জন্যে
তার টুকরোগুলিকে
যত্ন করে কুড়িয়ে তুলতে চাই।

কিন্তু পারি না।
আমারই জীবনের কয়েকটি অংশ আমার
হঠাৎ কেমন অচেনা ঠেকতে থাকে,
এবং কয়েকটি অংশ আমাকে চোখ মেরে আরও
দূরে গড়িয়ে যায়।
আমি বুঝতে পারি,
গঙ্গাতীরের তীর্থের দিকে পা বাড়ালেই এখন
বৃত্রাসুর আমার সামনে এসে দাঁড়াবে। এবং
মাসীর-কান-কামড়ানো সেই ছেলেটা আর কিছুতেই আমাকে
বাদুড়বাগানে পৌঁছতে দেবে না।

স্তব্ধ হয়ে আমি বসে থাকি।
উইয়ে-খাওয়া বইয়ের পাতা হাওয়ায় উড়তে থাকে।
আমি চিনে উঠতে পারি না যে,

এ কেমন হেমচন্দ্র, আর
এ কেমন বিদ্যাসাগর।

তখন পিছন থেকে আমি আবার
সামনের দিকে চোখ ফেরাই।
এবং আমি নিশ্চিত হয়ে যাই যে,
অতীতের সঙ্গে সম্পর্কহীন
বর্তমানের এই কবন্ধ কলকাতাই আমার নিয়তি ;
যেখানে
'কবিতীর্থ' বলতে কোনো কবির কথা কারও মনে পড়ে না,
এবং 'বিদ্যাসাগর' বলতে—
তেজস্বী কোনো মানুষের মুখচ্ছবির বদলে—
ইশকুল, কলেজ, থানা, বস্তি, অট্টালিকা, খাটাল, পোস্টার ও পয়ঃপ্রণালী-সহ
আস্ত একটা নির্বাচনকেন্দ্র
আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

ঘরের জন্যে ভাবনা

যারা গেছে, এখন আর তাদের জন্যে
শোক করবার সময় নেই।
যারা আছে,
যাও, তাদের এখন কাছে ডাকো।

পকেটে একটা মস্ত বড় ফুটো ছিল ;
অনেকগুলি সিকি আর আধুলি
তার ভিতর দিয়ে গড়িয়ে গেছে।
যাক্।
দু-চারটে কানাকড়ি এখনও আছে তো ?
লক্ষ রাখো,
তারাও যেন না যায়।

কোঁচার খুঁটে বেশ শক্ত করে একটা গিঁট দাও।
যা গেছে, তা আর ফিরবে না,
যা আছে,
তাই নিয়েই এখন থাকো।

ফলগুলো সব চোখের সামনে নষ্ট হয়ে গেল।
যাক্,
বোঁটার মাথায় দু-চারটে ফুল এখনও দুলছে।
দেখো, তারাও যেন না যায়।
ফল নিয়ে আর শোক করবার সময় কোথায়,
এখন শুধু
ফুলের জন্যেই চিন্তা।

পাড়াপড়শীরা বলেছিল,
বাড়ি তো হয়েছে, এখন বারান্দায় একটা

ময়না থাকলে দিব্যি হয়।
দূর ছাই,
বারান্দা আবার কোথায়?
মাঠ উঠোন আর বারান্দা এখন পিছু হটতে-হটতে
ঘরের মধ্যে এসে ঢুকেছে।
বারান্দার জন্যে এখন আর শোক করবার সময় নেই,
এখন শুধু ঘরের কথাই ভাবো।

লক্ষ রাখো,
যাবার টানে ঘরটাও যেন না যায়।

পারিনি, অভিসারিণী

একদিকে যখন আমার
ইচ্ছা ও অনিচ্ছার বস্ত্র ও অলঙ্কারগুলিকে আমি
ধুলোর মধ্যে ছড়িয়ে দিই,
অন্যদিকে তখন আমি দেখতে পাই যে,
নতুন নতুন
ইচ্ছা ও অনিচ্ছার বস্ত্র ও অলঙ্কারে
আমার শরীর আবার ভরে উঠছে।

ডালপালা থেকে সমস্ত পাতা ঝরিয়ে দিয়ে যখন
তোমার দিকে চোখ ফেরাই,
তখন আমার মনে হয়,
এই হাড়-কাঁপানো শীতের মধ্যেও আমি আবার নতুন পত্রপল্লবে
সবুজ হয়ে উঠছি।

আমি সম্পূর্ণ বিবস্ত্র ও নিরলঙ্কার হতে চেয়েছিলুম।
কিন্তু পারিনি। অভিসারিণী,
এই দ্যাখো,
আমার অঙ্গে আবার নতুন পট্টবস্ত্র ঝলমল করছে।
অনামিকায় নতুন অঙ্গুরীয়।
মাথায় নতুন উষ্ণীষ।

ভালবাসা ! ভালবাসা !

ঘর থেকে আমি বারান্দায় ছুটে আসি,
রেলিংয়ের উপরে ঝুঁকে পড়ে
চেঁচিয়ে বলতে থাকি : ভালবাসা ! ভালবাসা !
কিন্তু ধাবমান বালকেরা সেই আর্ত প্রার্থনায় সাড়া না দিয়ে
ছুটতে ছুটতে
রাস্তার মোড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

গোলাপগুলি শুকিয়ে যায়,
রজনীগন্ধার পাপড়ি ক্রমেই মলিন হতে থাকে।

আমি আমার কণ্ঠস্বরকে উঁচু থেকে
আরও উঁচু পর্দায় তুলে
ক্রমাগত বলতে থাকি : ভালবাসা ! ভালবাসা !
তারপর একসময়ে বুঝতে পারি যে,
সন্ধ্যারাতেই সমস্ত রাস্তা জনশূন্য হয়ে গেছে।
জানালাগুলি বন্ধ হয়ে যায়।

চোখের পাতা শুকিয়ে যায়,
বুকের মধ্যে শুকনো হাওয়ায় ধুলো উড়তে থাকে।

বকুল, বকুল, বকুল

'সামনে রিফুকর্ম চলছে,
পিছন দিকে রাস্তা বন্ধ।'
এই, ওরা কী যা-তা বলছে!
বকুল, তোমার বুকের গন্ধ
এই অবেলায় মনে পড়ে।

এই অবেলায় বকুল ঝরে
শ্যামবাজারে, ধর্মতলায়,
এবং আমরা তাকেই ধরছি
ফাঁদ পেতে চৌষট্টিকলায়।

এবং আমরা রাস্তাঘাটে
ফুটপাথে আর গড়ের মাঠে
কুড়িয়ে নিচ্ছি ছেলেবেলা।

'সন্ধ্যারাতে এ কোন্ খেলা?'
এই, ওরা কী যা-তা বলছে!
মাথার মধ্যে ফুলের গন্ধ।
সামনে সেলাই-ফোঁড়াই চলছে,
পিছন দিকে রাস্তা বন্ধ।

টিলার উপরে বাড়ি

দূর থেকে আমি দেখতে পাই,
টিলার উপরে
জুনের দীপ্ত দুপুরবেলায় জলজ্বল করছে সেই বাড়ি
জানালাগুলিতে
হলুদ রঙের পর্দা ঝুলছে।
কিন্তু যেহেতু রৌদ্র আছে, হাওয়া নেই,
তাই সেই পর্দা একটুও নড়ে না।
ছাতের রেলিংয়ে শুকোতে দেওয়া শাড়িও
একচুল সরে না।
সমস্তটাই কেমন ছবির মতো লাগে।

সমস্তটাই কেমন রূপকাহিনীর মতো লাগে।
মনে হয়,
এখুনি কোনো উড়ন্ত ঘোড়ার পাখার ঝাপটে
ঝড় উঠবে।
আর ওই ঘুমন্ত বাড়িটাকে জাগিয়ে দেবার জন্যে
দিগন্ত থেকে
নিষ্ঠুর ও পরাক্রান্ত এক প্রেমিকের মতো
ছুটে আসবে হাওয়া।

ধাক্কা

'হঠাৎ একটা ধাক্কা লেগে গেছে,
তার জন্যে অত মেজাজ দেখাচ্ছেন কেন ?
কেউ কি কাউকে ইচ্ছে করে ধাক্কা মারে ?'

রাস্তা থেকে সরে দাঁড়াই।
কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও বিপজ্জনক সেই প্রশ্নটাকে আর
মাথার থেকে বিদায় দিতে পারি না।
সমস্ত কাজ আর অকাজের মধ্যে
সারাটা দিন
একটাই মাত্র প্রশ্ন আমার
মাথার মধ্যে ঘুরপাক খায়।

কেউ কি কাউকে ইচ্ছে করে ধাক্কা মারে…
কেউ কি কাউকে ইচ্ছে করে ধাক্কা মারে…
কেউ কি কাউকে…

হা ভগবান, কার অনিচ্ছার ধাক্কা খেতে-খেতে
কোথার থেকে
এ কোন্ জাহান্নমে আমরা চলেছি।

অগ্নিসাক্ষী

‘এই আমি তোমার মুখখানিকে আমার
হাতের মধ্যে নিয়েছি।
এই তাকে ওই
আগুনের দিকে ঘুরিয়ে দিলাম।
বলো,
স্বপ্নে তুমি কার কাছে গিয়েছিলে?
অন্ধকারে, ঘুমের ভিতরে তুমি কার
নাম নিয়েছিলে?’

টিনের চালের উপরে
ঘামের মতো
বিন্দু-বিন্দু হিম ফুটছে,
পুকুর থেকে—হালকা একটা ওড়নার মতো—
আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে
কুয়াশা।
তারা দুজনে গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠের বুকে নামল।

‘বলো, তুমি কাল রাত্রে কার অধিকার
কাকে দিয়েছিলে?’

মাঠের মধ্যে আগুন জ্বলছে।
মাঘের রাত্রে হঠাৎ ঝড় উঠল।
আগুনের শরীর ছুঁয়ে দিগ্বিদিকে চেঁচিয়ে ফিরতে লাগল
হাওয়া :
‘কাকে…কাকে · কাকে দিয়েছিলে?’

বনের মধ্যে ঝড়

নিজেকে একটা দারুণ রকমের ঝাঁকুনি দিয়ে
তেজী ও সরল
শালগাছের মতো তোমরা উঠে দাঁড়িয়েছ।
এবং বুঝতে পারছ,
তোমাদের শরীর থেকে এখন জীর্ণ বাকলগুলো
একটা একটা করে খসে যাচ্ছে।
পৃথিবীর সমস্ত কাঠুরিয়াকে ভয় পাইয়ে দিয়ে
এখন তোমাদের চেঁচিয়ে উঠবার সময়।
এখন তোমাদের বলবার সময় :
দূরে যাও!

বনস্থলীর মধ্যে আমি দাঁড়িয়ে আছি।
দেখতে পাচ্ছি, ঝড় উঠেছে,
ডালপালা থরথর করে কাঁপছে।
দেখতে পাচ্ছি, হাওয়ার মধ্যে—
সার্কাসের হাজার-হাজার ভাঁড়ের মতো—
ডিগবাজি খেতে-খেতে উড়ে যাচ্ছে
পুরনো শালপাতা।

যাওয়া, তারই দিকে

যদি যাই
মাথার উষ্ণীষ আমি তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাব।
যদি যাই,
গৃহদেবতাকে শান্ত, অনুচ্চ গলায় বলে যাব :
এই যাওয়া শেষ যাওয়া।
প্রত্যাবর্তনের পথ সযত্নে চিহ্নিত করে গিয়েছিলে তুমি।
তাকে যাওয়া বলে ?

বুকে জ্বলে মাটির প্রদীপ।
স্মৃতির অতলে
ধীরে সঞ্চারিত হয় বিগত-জন্মের মৃদু হাওয়া।
যাত্রা হোক তারই দিকে যাওয়া।

যদি যাই,
তরঙ্গকে বলে যাব : শান্ত হও।
বৃক্ষকে জানিয়ে যাব : সংবরণ করো সব কথা।
মধ্যরাতে
জনশূন্য রাজপথে যেতে-যেতে প্রার্থনা জানাব :
সময় হয়েছে, এইবারে
নিদ্রার গভীর থেকে উঠে এসো, নগ্ন সরলতা।

অঞ্জলিতে ছেলেবেলা

এই তো আমার অঞ্জলিতেই মস্ত পুকুর,
কেউ আচম্‌কা ছুঁড়লে ঢেলা
দেখতে থাকি কেমন করে প্রকাশ্য হয়
খুব নগণ্য ছেলেবেলা।

দর্পণে মুখ লগ্ন রেখে ছোট্ট খুকুর
এখন দিব্যি কাটে সময়।
কাটুক, এখন হাওয়ায় উড়ছে অনভ্যস্ত শাড়ির আঁচল,
অঞ্জলিতে টলটলে জল।

প্রৌঢ় বোঝে প্রৌঢ়তা কী, বৃদ্ধ বোঝে
বয়স বলতে কী ঝামেলা,
কিন্তু খুকু, এখন তুমি এতই অল্পবয়স্ক যে,
তোমার উপলব্ধিতে নেই ছেলেবেলা।

যখন থাকবে, তখন তুমি অনেক বড়,
কিন্তু তখন আর-এক শীতে
নজর করলে দেখতে পাবে, কেমনতরো
জলের বর্ণ পালটে গেছে অঞ্জলিতে।

কেউ বলে জল, কেউ-বা স্মৃতি, কেউ-বা সময়,
কেউ আচম্‌কা ছুঁড়লে ঢেলা
হঠাৎ যেন একটু-একটু প্রকাশ্য হয়
খুব নগণ্য ছেলেবেলা।

নিজ হাতে, নিজস্ব ভাষায়

এখন নিজস্ব শ্রমে যাবতীয় উদ্যানের বেড়া
বেঁধে দিতে ইচ্ছা হয়।
স্নেহের চুম্বনখানি এঁকে দিতে ইচ্ছা হয়
সমস্ত শিশুর গালে।
সমস্ত দেওয়ালে
এখন নিজস্ব হাতে নিজস্ব ভাষায় গিয়ে লিখবার সময় :
কে ভালবাসার দিকে তুলেছ বন্দুক,
দূরে যাও।

ভালবাসা ছাড়া কি দ্বিতীয় কোনো উচ্চারণ
মানায় কবির কণ্ঠে ?
অস্ত্র নিয়েছিলে হাতে, এই দৃশ্য দেখেছি সবাই।
কিন্তু কে না জানে,
লক্ষ্যের বিচারে সেও শুদ্ধ ভালবাসারই সংগ্রাম।

ভালবাসা কবিতারই অন্য নাম।
যে-নাম হৃদয়ে তুমি উৎকীর্ণ করেছ, তাই জানো :
এখন সমস্ত মিথ্যা
কদর্য-অক্ষরে-লেখা সব গ্লানি ভুলবার সময়।

এখন নিজস্ব হাতে সকলকে সুশ্রী করে তুলবার সময়।
নিজস্ব ভাষায়
অঙ্কুরিত প্রতিটি বীজের কাছে নতজানু হয়ে
এখন বলবার লগ্ন :
গোপন থেকো না বৃক্ষ, তোমার নিজস্ব আলো নিজস্ব হাওয়ায়
নিজস্ব নিয়মে বেড়ে ওঠো।

কাম্ সেপটেমবর

কনেটিকাট অ্যাভিনিউয়ের উপরে আমি দাঁড়িয়ে ছিলুম।
তখন সেপটেমবর মাস,
নতুন বিশ্বে গাছের পাতা তখন হলুদ হয়ে যাচ্ছে।
শেষ রাত্তিরে বৃষ্টি হয়েছিল,
রাস্তার উপরে তার চিহ্ন তখনও মুছে যায়নি।
ইতস্তত জলের বৃত্ত,
তার মধ্যে ঝিকিয়ে উঠছে সকালবেলার রোদ্দুর।
দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আমি দেখছিলুম।

কাফেটেরিয়ায় গান বাজছিল :
কাম্ সেপটেমবর
আমি দেখছিলুম যে, উত্তর গোলার্ধে শরৎ এসেছে,
গাছের পাতা অগ্নিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে,
এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছে,
হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে মেপ্‌ল আর সাইপ্রিসের পাতা।
আমি ভাবছিলুম যে, এখন শরৎকাল,
পৃথিবীর এখন সাজ ফেরাবার সময়।

কনেটিকাট অ্যাভিনিউয়ের উপরে আমি দাঁড়িয়ে ছিলুম,
বুক ভরে আমি নিশ্বাস নিচ্ছিলুম,
কাফেটেরিয়ায় গান বাজছিল :
কাম্ সেপটেমবর।
আমার চতুর্দিকে কালো মানুষের ভিড়।
আমার ভীষণ ভাল লাগছিল।

খোলা মুঠি

মুঠি খোলো,
কী আছে, দেখাও।

কিছু নেই,
পথে-পথে শিশুরা যা কুড়িয়ে বেড়ায়
বারো মাস,
তা ছাড়া কিছুই নেই।

মুঠি খোলো,
কী আছে গোপন, দেখতে দাও।

এই ছাখো,
পথে-পথে যা-কিছুকে উড়িয়ে বেড়ায়
খেয়ালী বাতাস,
তা ছাড়া কিছুই নেই।
কিছু ধুলো, কিছু বালি, কিছু-বা শুকনো পাতা, ঘাস

পর্বতচূড়ায়

প্রাপ্তি যৎসামান্য, তবুও
তারই জন্যে
ঝরালে অজস্র স্বেদ, অজস্র শোণিত।
এবারে নিজেকে দাও ছুঁয়ো,
কেননা, দেখতেই পাচ্ছ,
চূড়ায় রয়েছে শুধু অন্তহীন শীত।

যা-কিছু বলুক অন্যে
এরই নাম আরোহণ, এরই নাম সাফল্য, উন্নতি।
বসন্ত নিদাঘ বর্ষা শরৎ হেমন্ত পার হয়ে
অনিবার্যভাবে
এরই দিকে যাওয়া।
এই প্রাপ্তি—শ্বা-দন্তের মতন ধারালো এই হাওয়া।

এই লাভ, এরই জন্যে স্বীকার করেছ এত ক্ষতি।
এই জয়, এরই জন্যে নিমগ্ন হয়েছ পরাজয়ে।
এই যে প্রতিষ্ঠা, তুমি এর
জয়ধ্বনি গলায় ধরেছ,
এরই জন্যে ঈশ্বরকে বর্জন করেছ।
এবারে নিজেরই সঙ্গে আয়োজন করো
শীর্ষ-বৈঠকের।

নীচে পৃথিবীতে সেই আগের মতই ধীরে পেকে ওঠে ধান্য ও গোধুম ;
ধীরে স্বাদু হয়ে ওঠে ফল ;
সন্ধ্যায় যখন ক্লান্ত শিশুর সর্বাঙ্গে নামে ঘুম,
সমুদ্রের জল
জ্যোৎস্নার চুম্বনে জেগে ওঠে ;
উঠোনে যথার্থ জুঁই ফোটে ;

লণ্ঠনের চতুর্দিকে ঘরোয়া মজলিস বসে যায়।
হায়,
সংবাদ রাখো না তুমি তার।

যা-কিছু বলুক অন্যে,
পর্বতচূড়ায়
প্রাপ্তি যৎসামান্য, তবুও
তারই জন্যে
ঝরালে অজস্র স্বেদ, অজস্র শোণিত।
হাড়ে ও মজ্জায় তবে এবারে গ্রহণ করো শীত,
এবারে নিজেকে দাও ছুঁয়ো।

বিদায় বলতেই

বিদায় বলতেই চোখে ভেসে ওঠে বিকেলের আলো ;
মনে হয়,
জন্মাবধি বর্ষার প্রবল
বৃষ্টির ভিতর দিয়ে এগোতে-এগোতে আমি এইমাত্র শরতে পৌঁছেছি
বিদায় বলতেই যেন জাহাজের যাত্রা শুরু হয়ে যায় ;
মনে হয়,
পিছনে তাকালে দেখতে পাব,
বন্দরে দু-একটি বন্ধু দাঁড়িয়ে রয়েছে,
পত্রপত্রালির থেকে এখনও গড়িয়ে পড়ছে বিন্দু-বিন্দু জল।

গোপন মুনিয়া

চঞ্চল মুনিয়াগুলি অতর্কিতে উধাও হয়েছে।
রৌদ্র আর বাতাসের ধার
মেঘ বৃষ্টি আকাশের সারাংসার
এরই মধ্যে পাখির কি জানা হয়ে গেছে ?
ঠোক্‌রানো হয়েছে সব ফল ?
ওষ্ঠে চেপে এরই মধ্যে সমাপ্ত জানা কি
সমস্ত শস্যের স্বাদ ?

কার সঙ্গে লেগেছে বিবাদ ?
ওরে পাখি, ওরে ও ছট্‌ফটে ছোট পাখি,
চোখের সমুখে ছিলি, বেশ ছিলি, রাত
না-হতেই কেন অকস্মাৎ
ঢুকেছিস বুকের ভিতরে ?
এখন বাহির স্তব্ধ, বুকে লাগে ডানায় ঝাপট ;
ভিতর-ভুবন থেকে শব্দ ওঠে :
ক্রর্‌র্‌-ক্রর্‌র্‌-কট্‌···ক্রর্‌র্‌-ক্রর্‌র্‌-কট্‌।

অদৃশ্য মুনিয়া, তোরা খানিক আগেও দিব্য দৃশ্যমান ছিলি
অরণ্যে, প্রান্তরে, কখনো-বা
ছাতের কার্নিশে। কেন উড্ডীন খেয়ালী সেই শোভা
গুটিয়ে নিমেষে তোরা নিজেকে গোপন করে নিলি
দিবস না-যেতে ? কেন অসময়ে অন্তরালে গিয়েছিস ?
রৌদ্রের আশ্লেষে খুব বারুদের গন্ধ ছিল নাকি ?
শস্যক্ষেত্রে হাওয়ার চুম্বনে ছিল বিষ ?

ওরে পাখি, রঙের ফুট্‌কির মতো পাখি,
চতুর্দিক না-হতে আঁধার, কেন না-ফুরাতে বেলা
হঠাৎ ভিতরে গিয়ে লাগালি শব্দের এই ঠেলা ?

চোখের সমুখে
এতক্ষণ যারা ছিল, এখন রয়েছে তারা বুকে।
বুকের ভিতরে শব্দ ওঠে-পড়ে,
বুকের ভিতরে
বর্ণের আগুন জ্বলে ধিকিধিকি :
চিকি-চিকি···চিকির-চিকির-চিক্···চিকিচিকি

বর্ণে-বর্ণে

পূর্বাকাশে তাকিয়ে থাকতে
যে-লোকটা এই মাঠে আসত,
এখন তারই পাঁচ আঙুলের মধ্য থেকে
ঝরে পড়ছে সূর্যাস্ত।

লোকটা জানত ছবি আঁকতে।
কিন্তু লোকটা একনিষ্ঠ,
এ-জন্যে সে
অন্য বর্ণে মগ্ন হয়নি সকালবেলার বর্ণ ছাড়া।

এখন দিনের প্রান্তে এসে
লোকটা ভাবছে (ওষ্ঠে একটু মলিন হাস্য) :
কেউ কি আমার বুকের মধ্যে অন্যরকম ঠেলা দিচ্ছে ?
দিক্ গে, আমি
রাত পোহালেই আবার হব পূর্বাস্য।

রক্তবর্ণ নদীর জলে লোকটা তুলি ধুয়ে নিচ্ছে।

সন্ধ্যাবেলায়

এখন আবার এ কোন্ খেলায়
বাঁধতে চাইছ পাকে-পাকে ?
বুকের মধ্যে বাঁধনগুলি খুলতে থাকে
সন্ধ্যাবেলায়।

সরোবরের মধ্যে ঢেলা
কখন ছুঁড়েছিলে, আমার
কিচ্ছু মনে পড়ে না আর
সন্ধ্যাবেলায়।

তাৎপর্য

একটা ছিল অরণ্যে, আর
একটা ছিল ঘরে,
তার ফলে তাৎপর্য ছিল বিশ্ব-চরাচরে।

কাল সকালে দাওয়ায়
গিয়ে দেখলুম, খাঁচার পাখি দরজা খুলে হাওয়া।

যাক্‌গে, তাতে যোগফলে একতিলও
কমতি হয়নি, বন্দী পাখি ততক্ষণে তার
ডানার উপর ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপট লাগাচ্ছিল।

একটা ছিল অরণ্যে, আর
একটা আকাশ পারে,
তার ফলে তাৎপর্য ছিল সমস্ত সংসারে।

আজ সকালে, এ কী,
দরজা খুলে বাইরে এসে দেখি,
অরণ্যে চুপ পত্রপুষ্পশাখা,
অন্য দিকে মাথার উপর আকাশ করছে খাঁখাঁ।

আকাশের ওই নীলে, নাকি বনের ওই সবুজে
এখন আমি কোন্‌খানে তাৎপর্য নেব খুঁজে ?

জানলা

জানলা খুললে চোখের সামনে সূর্য ওঠে, আর
ভোরের স্বপ্নে সম্মতি দেয়
সমস্ত সংসার।
নদীর জলে কাঁপন লাগে,
জুঁই-টগরের ঠোঁটে
হঠাৎ হাসি ফোটে।
সেই হাসিটাই বুকের মধ্যে জাগায়
স্বপ্ন, এবং কাজের মধ্যে সম্মত রঙ লাগায়।
কিন্তু তোমার স্বপ্ন দেখতে, হাসি দেখতে বারণ,
জানলাটাকে বন্ধ রাখার
সেইটে মস্ত কারণ।

বুকের মধ্যে রাত্রি

মেয়েটাকে যেই বলেছি 'তুই বড়ো মুখরা',
অমনি আমায় হাজার হাতে ঘিরে ধরল জরা।
চক্ষু পাল্‌টে, আঙুল মট্‌কে, হঠাৎ দিয়ে তুড়ি
চতুর্দিকে নামিয়ে দিল বৃদ্ধ বটের ঝুরি।

চাঁদ কি সেদিন পূর্ণ ছিল, ফুল কি ছিল বনে,
এই কথা আজ ভাবতে থাকি গভীর সঙ্গোপনে।
বুকের মধ্যে রাত্রি এখন, বাইরে জ্বলে হীরা,
দেখতে থাকি, রৌদ্রে ঘোরে যুবক-যুবতীরা।

আরো-একটু বাঁচা

এতক্ষণ তো ছিলুম, এখন
মনে হচ্ছে, আছি ;
আরো-একটু সময় পেলে
আরো-একটু বাঁচি।

আরো-একটু দেখি মানুষ,
শ্রমের চিত্র, আর
নোংরা নয়ানজুলির মধ্যে
বিম্বিত সংসার।

তার মানে তো আর-কিছু নয়,
বিমুক্ত রোদ্দুরে
বৃন্দাবনী সারং বাজে
সারা আকাশ জুড়ে।

সন্ধিলগ্ন

সন্ধ্যাবেলার মঞ্চে এসে
দাঁড়ায় পাত্রপাত্রী ;
এর ভুবনে দিনের আলো,
ওর ভুবনে রাত্রি।
একজনে আর-জনের দিকে
যেই ফিরে তাকালো,
ছড়িয়ে গেল মঞ্চে অমনি
কনে দেখার আলো।

তোমাকে, স্বাধীনতা

যখন তোমাকে পেয়েছিলুম, স্বাধীনতা,
আমার বয়স তখন বাইশ বছর।
সেই বয়স,
পা দুখানা যখন রন্-পা'র মতো ছুটে বেড়ায়,
আর হাত দুখানা ঊর্ধ্বে উঠে
আকাশটাকে মাটির উপরে খসিয়ে আনে।

সাতচল্লিশে তোমাকে পেয়েছিলুম, স্বাধীনতা।
আর আজ
আমার নিজেরই বয়স সাতচল্লিশ।
সেই বয়স,
পথের মাঝখানে হঠাৎ একটু দাঁড়িয়ে গিয়ে
মানুষ যখন একবার তার পিছনে তাকায়,
একবার সামনে।

পিছন বলতে পঁচিশ বছর, স্বাধীনতা,
তোমার আর আমার যৌথ জীবনের বয়স।
এই পঁচিশ বছর
পরস্পরকে আমরা আগলে রেখেছি।
পরস্পরকে ভালবেসে, পরস্পরকে
আরও
দীপ্ত, আরও ব্যাপ্ত করতে চেয়েছি।

আর সামনে বলতে অনন্তকাল,
অনেক যুগ, অনেক যুদ্ধ, অনেক অনেক চেষ্টা এবং উত্তরণ।

অ-দেখা সেই যুগ আর সেই যুদ্ধ আর সেই চেষ্টা আর সেই
উত্তরণের মধ্যেও আমি

বেঁচে থাকব, স্বাধীনতা।
ফিরে পাব আমার বাইশ বছর বয়সকে।
যার
পা দুখানা রন্‌-পা'র মতো ছুটে বেড়ায়, আর,
হাত দুখানা আকাশটাকে কেড়ে আনে,
তাকে তুমি চিনতে পারবে না ?

বুকের মধ্যে চোরাবালি

অন্ধকারের মধ্যে পরামর্শ করে
গাছগাছালি,
আজ এই রাত্রে কার ভালো আর
মন্দ কার।
হাওয়ার ঠাণ্ডা আঙুল গিয়ে স্পর্শ করে
ঠিক যেখানে
বুকের মধ্যে নদী, নদীর বুকের মধ্যে
চোরাবালি।
স্রোতের টানে
আশিরনখ শিউরে ওঠে অন্ধকার।

চিরমায়া

বাহিরে দেখি না, শুধু স্থির জানি, ভিতরে কোথাও
চৌকাঠে পা রেখে তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছ,
চিরমায়া।
দাঁতে-চাপা অধরে কৌতুক স্থির বিদ্যুতের মতো
লগ্ন হয়ে আছে, ভুরু
বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বাঁকানো, জ্বলে
কোমল আগুন
সিঁথি ও ললাটে। স্থির সরসীর মতো দুই চোখে
চক্ষু রেখে জগৎ-সংসার
অকস্মাৎ তার
কার্যকারণের-সূত্রে-গাঁথা মাল্যখানিকে ঘোরাতে
ভুলে যায়।

বাহিরে দেখি না, কিন্তু ভিতরে এখনো
ওই মূর্তি জাগিয়ে রেখেছ,
চিরমায়া।
বুঝি না কী মন্ত্রে তুমি জয়ে-বিপর্যয়ে
লগ্ন আজও রয়েছ হৃদয়ে।
কী রয়েছে ওই চোখে, অধরে অথবা
ওই যুগ্ম ভুরুতে তোমার ?
প্রত্যাশা, না পরিহাস ? নাকি যুদ্ধশেষে ফের যুদ্ধঘোষণার
অভিপ্রায় ?
কিছুই বুঝি না, চিরমায়া,
এক অর্থ উদ্ধার না-হতে যেন সহসা আর-এক অর্থ
খুলে যায়।

বেঁধেছ অলক্ষ্য ডোরে। যে-রকম উড্ডীন পাখিও

বস্তুত অরণ্যে বাঁধা, কিংবা দিগ্বিজয়ীও যেমন
অদৃশ্য সুতোয়
টান পড়বামাত্র তার একমাত্র-নারীর
জঙ্ঘা অবলোকনের জন্য বড় ব্যস্ত হয়ে ওঠে,
চিরমায়া,
আমিও তেমন ফিরি, নতজানু হয়ে
নিরীক্ষণ করি ওই জঙ্ঘা ও জঘন, স্তনসন্ধির গোপনে
রাখি মুখ। আমিও তেমন
বুঝে নিতে চেষ্টা করি দাঁতে-চাপা ওষ্ঠের ইঙ্গিত।
এবং দেখি যে, স্থির সরসীর মতো দুই চোখে
পলকে পলকে
স্বর্গ-মর্ত-পাতালের ছায়া
দুলে যায়।

ছিল কি ছিল না

ছিল কি না-ছিল দুঃখ খররৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনে,
ছিল কি না-ছিল তৃপ্তি অন্ধকারে কাঁথায়-কৌপীনে।
ছিল কি না-ছিল তার অজন্তা-নারীর মতো নাভি
ইঙ্গিতে স্ফুরিত, আজ ক্বচিৎ-কখনো তাই ভাবি!

ক্বচিৎ কখনো খুব বৃষ্টি হয় অঘ্রান-দিবসে,
ভল্লুকের মতো মেঘ পর্বতশিখরে পিঠ ঘষে।
'এইবারে শীত পড়বে,' বৃদ্ধেরা বলেন। 'তাতে ক্ষতি
কিছুমাত্র নেই,' বলে হেসে ওঠে যুবক-যুবতী।

যুবক নির্বোধ বড়ো, যুবতীও নীবিবন্ধে ঢিলা
দিয়ে চিরকাল শুধু নিজের সম্পর্কে দয়াশীলা।
নিশ্বাসে আগুন নিয়ে দ্রুত পায়ে তারা হেঁটে যায়।
আরও উষ্ণতার খোঁজে অন্ধকার পর্বতগুহায়।

ছিল কি না-ছিল অগ্নি পর্বতগুহার অন্ধকারে,
ছিল কি না-ছিল শিলা ভাসমান যৌবনপাথারে,
ছিল কি না-ছিল ওষ্ঠে ওষ্ঠের কুলুপ, এই নারী
পড়ন্ত বেলায় বসে ক্বচিৎ-কখনো তাই ভাবি।

জোনাকি-রহস্য

তুমি যেমন খুব-অক্লেশে নিজের জমি ছাড়তে পারো
আমি তেমন পারি না,
তুমি যেমন অন্যকে অশক্ত জেনে হারতে পারো
আমি তেমন হারি না।
তার মানে তো এই যে, আমি
মানুষটা নই বিশেষ দামী,
আকাশে হাত বাড়াই বটে, কিন্তু নভশ্চারী না।

মাছের যেমন জলে স্ফূর্তি, পাখির যেমন আকাশে, ঠিক
আমার তেমনি মাটিতে।
বস্তুত ঘরকুনো আমি, যার যা-খুশি ফুসলানি দিক
যাই না বহির্বাটীতে।
তার মানে তো এই যে, ঝুঁকি
নিই না, আমি স্বল্পে সুখী,
সারাটা দিন বসে থাকি নিজস্ব এই ঘাটিতে।

কিন্তু সারা দিনের শেষে আকাশে অসংখ্য তারা
যখন ফোটে, ঢিমে সেই
ত্রিতাল হঠাৎ চৌদুনে চায় চলতে, তখন ছন্নছাড়া
রক্তে যেন কী মেশে।
তার মানে কি এই যে, আমার
এক চরিত্র দিবসে, আর
রাত্রি এলেই সেই আমি ফের পালটে যাচ্ছি নিমেষে?

এক মনে যে ময়লা ঘাঁটে সারাটা দিন, দিনান্তে সে-ই
হঠাৎ অন্যমনা কি?

দিনের বেলায় যা ধুলো তার দৃষ্টিতে, তাও দিন ফুরালেই
চূর্ণ-চূর্ণ সোনা কি ?
ঠিক বুঝি না, সূর্য পাটে
বসলে কেন সাঁতার কাটে
তার সমগ্র ভাবনা জুড়ে মস্ত একটা জোনাকি।

কেউ জানে না

কেউ জানে ? কেউ জানে ?
খুব প্রকাশ্যে গিয়েছিলুম, কিন্তু আমার যাবার ছিল
অন্যরকম মানে।
আসল কথা, তোমার কাছে একটা-কিছু পাবার ছিল
কিন্তু সেটা কী যে,
সেই রহস্য বুঝতে এখন চেষ্টা করছি নিজে।

লছমন মাহাতো

এক মিনিটের জন্যে একটা ট্রেন ফেল করে
তারপর
পুরো একটা দিন
অখ্যাত সেই ইষ্টিশানে আমাকে বসে থাকতে হয়েছিল।
তখন ভেবেছিলুম,
কী লোকসান, কী লোকসান!

এখন ভাবি,
লাভের ঘরেও শূন্য নয়।
বিহার-বক্তিয়ারপুর লাইনের সেই ইষ্টিশানে যদি না আটকা পড়তুম,
তাহলে
গমের খেতের সোনার উপরে
টিয়ার ঝাঁকের সবুজ কীভাবে লুটোপুটি খায়,
তা আমার অজানা থেকে যেত।

তা ছাড়া
আলাপ হত না গ্যাংম্যান লছমন মাহাতোর সঙ্গে।
কাছাকাছি কোনও হোটেল আছে কিনা, জিজ্ঞেস করায়
লছমন আমাকে বলেছিল, 'নেই।
কিন্তু দেখিস,
পেটে যদি ভুখ থাকে, তাহলে
লছমনের-পাকানো রান্নাও তোর খারাপ লাগবে না।'

বর্ষা-রজনী

হাওয়া এক উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক,
বোঝে না সে কোন্‌টা কোন্‌ দিক,
দিগ্বিদিকে শুধু ছুটে মরে।

এই বৃষ্টি ভীষণ গোঁয়ার,
ধরিত্রী ভাসাবে—পণ তার,
সারা রাত্রি ঝরে, শুধু ঝরে।

শয্যায় বিবশা এক নারী
ধরিত্রী যেন-বা, তার শাড়ি
ভেসে যায় বৃষ্টির ভিতরে।

যে শেখায়

আকাশ আমাকে উদার হতে শেখায়,
বৃক্ষ শেখায় সহিষ্ণু হতে।
নদী আমাকে নির্মল হতে শেখায়,
পাহাড় শেখায় স্তব্ধ হতে।

আমি শিশুকে বলেছিলুম, 'আমাকে
কাপট্য পরিহার করতে শেখাও।'
আমি নারীকে বলেছিলুম, 'আমাকে
মধুর করো।'

কিন্তু আকাশ, বৃক্ষ, নদী, পাহাড়, শিশু ও নারীর কাছে
নতজানু হবার পরেও
আমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না।

রাত্রির অন্ধকারে হারিয়ে যাবার আগে
আমার এক বন্ধুর বাবা আমাকে শিখিয়ে দিয়ে গেলেন যে,
বন্দুকের নল পরিষ্কার করতে করতে,
এমন কী,
নিজের ছেলের সঙ্গেও কোনো তর্কে লিপ্ত হতে নেই।

কুলুঙ্গি

গোপন রইল না কিছু। নাকি রইল ? কুলুঙ্গির ভিতরে কিছু কি
রেখে দিয়েছিলে ?
যেমন একদা রাখতে, রেখে পরমুহূর্তে আবার
ভুলে যেতে।
জানি না, তেমন করে আজও ফের কোনোখানে কিছু
রেখে দিলে কি না।

যা জানি, তা-ই কি ঠিক জানি ?
বস্তুত কিছুই আজও সম্যক জানি না।
শুধু দেখি, অন্ধকারে পৃথিবীর ছাত আরও নিচু
হতে থাকে।
দেখি, সেই অন্ধকারে মাটি তার বুকের কাপড়
এক পাশে সরিয়ে নেয়।
কে যেন নিঃশব্দে এসে ঘরের ভিতরে দেয় উঁকি।

বাতাসে জুঁইয়ের গন্ধ ভাসে।
কিছু কি গোপন রইল ? কোনোখানে তবুও কিছু কি ?

বরাক ব্রিজ

ওইখানে তোরঙ্গ ছিল। এবং তোরঙ্গ যার, সেও ছিল।
সে এখন নেই। তার
তোরঙ্গ তালা ও চাবি, শাড়ি ও ব্লাউজ
কিছু নেই।
বৃষ্টিতে সমস্ত ভেসে গেছে।

তা-ই যায়।
যা সংগ্রহ করে নারী, তাকেই যখন তুমি নারী বলে জানো,
তাকেই নিজের কাছে টানো,
তখনই সমস্ত ভেসে যায়।
না নারী, না তার স্তন্যে লালিত সংসার,
কিছুই থাকে না।

এমন কী, নদীও রাখে না
কোনো স্মৃতি।

শুধু তুমি মনে রাখো। জ্যোৎস্নায় ধবল
ব্রিজের উপরে গিয়ে দাঁড়ালেই মনে পড়ে যায়
বিগত বন্যার কথা।
মনে পড়ে,
পাথরে পা রেখে-রেখে উঠে এসেছিল
বরাকের জল।

সবাই যায় না

‘চলো যাই’ বললেই কি যাওয়া যায়?
অন্তত অনেকে
অমন হুট্‌পাট করে কোথাও যায় না।
আগে তারা পাঁজিপুথি দেখে
জেনে নেয়,
পথের কোন্‌খানে রাত্রি হানা দেয়,
কোন্‌খানে বুকের মধ্যে হেসে ওঠে অলীক হায়েনা।

সবাই যায় না, কিন্তু কেউ কেউ যায়,
এইটে সার কথা।
অন্তত একজন কবি এইরকম বলতেন একদা।

বোকা লোকটা

মাথার ভিতরে ছিল মস্ত সভা, অন্য আর কিছুই ছিল না।
রোদ্দুরের থেকে তাই সোনা
চুরি হয়ে গেল। তাই সৌন্দর্য গোপন করে নিল
সমস্ত পাহাড়। শুধু ছিল
মস্ত বড় সভা তার মস্ত বড় মাথার ভিতরে।

পিছনে মিলিয়ে যায় পুরুলিয়া। এখন পুনশ্চ তার ঘরে
লোকটা ফিরে যাচ্ছে। কিছু ধুলো, কিছু বালি
ছাড়া সে পেয়েছে মোট তিরিশটি ভক্তের করতালি।

কেউ তাকে শোনায়নি টুসু, কেউ
দেখায়নি ছোয়ের বিক্রান্ত কোনো ঢেউ।
বোকা লোকটা। তার
ছায়া দেখে মুখ ফেরায় বাঘমুণ্ডি পাহাড়।

শব্দে-শব্দে টেরাকোটা

আমি কি তোমার কাছে সনন্দ নিয়েছি কবিতার,
যে আমি তোমার জন্যে যাব
পাতালে, অথবা উর্ধ্বে আকাশে ফোটাব
তোমারই আলেখ্য ? ঝানু বুড়ো,
আমি কি তোমার কাছে সনন্দ নিয়েছি কবিতার ?

যে যার নিজস্ব শিল্প সমূহ অর্জন করে নেয়।
নির্ভয়ে যে যার
কবিতার হস্তপদমুড়ো
অর্থাৎ শব্দকে ঘোর চুল্লির ভিতরে ঠেলে দেয়
চিরকাল। আদ্যন্ত এইভাবে হয়ে খাঁটি
বর্ষার বিরুদ্ধে লড়ে মন্দিরগাত্রের পোড়ামাটি।

আমি কি তোমার কাছে সনন্দ নিয়েছি কবিতার,
যে আমি তোমার কীর্তি গেয়ে
ধন্য হব ? তুমি কি জিহ্বায়
জেনেছ অগ্নির স্বাদ ? শব্দের সংসারে তুমি কে হে ?

কিছু শব্দ অগ্নিকুণ্ডে ঝরে গিয়েছিল, তা-ই যায়।
কিছু যায় ভিখারীর পাত্রে। কিছু ফোটে
রমণীর জঙ্ঘাদেশে। কিছু হরিচন্দনের ফোঁটা
হয়ে নিদ্রাহীন গ্রীষ্মরাত্রির আকাশে জ্বলে ওঠে
দুই লহমার জন্যে। কিছু শব্দ আর-একটু দীর্ঘায়ু হতে চায়।
এবং তখনই
শব্দের হৃৎপিণ্ডে ছেনি-হাতুড়ির ধ্বনি
লাগে, শব্দে জেগে ওঠে বিষ্ণুমন্দিরের টেরাকোটা।

শরীর বললে শরীর

শরীর বললে শরীর, কিন্তু
ধুলো বললে ধুলো।
যে-নাম তোমার ইচ্ছে, দাও।
বড় অর্থহীনভাবে ছড়িয়ে গিয়েছে শব্দগুলো।

এই বড়বাজার থেকে কী তুমি সংগ্রহ করতে চাও?
প্রেম বললে প্রেম, কিন্তু
ঘৃণা বললে ঘৃণা।
একটিই রহস্য দুই ভিন্ন নামে চলে গেল কিনা,
কেউ জানে?

এখানে-ওখানে
ফাটা বালিশের থেকে শব্দগুলো উড়ে-উড়ে যায়।
হায়,
আঁজলায় নিয়েছ যাকে, সে বড় চঞ্চল।
আগুন বললে আগুন কিন্তু
জল বললেই জল।

দূরে রইলে, তাই

কেউ নাম করছি না তোমার,
তবু দেখি বিস্মৃতির ধুলো
ঢাকছে না তোমাকে। তুমি আর
কতকাল বাঁচবে? ছেলেগুলো
হাতে নিয়ে নিজস্ব কলিজা
কেন আজও তোমার বাড়িতে
জলকাদা ভেঙে চলে যায়?
ওদের কী পারো তুমি দিতে?

তুমি শুধু ভদ্রতার বাঁধা
সড়কে হেঁটেছ। তুমি দল
পাকালে না, চতুর্দিকে কাদা
ছুঁড়লে না কখনো, তুমি জল
ঘুলিয়ে দিলে না, শূন্যে ছাই
ওড়ালে না। সঙ্ঘবদ্ধতার
থেকে তুমি দূরে রইলে, তাই
কেউ নাম করছি না তোমার।

রাত-দুপুরে

খুব-প্রণয়ের নেশায় অনেক রাস্তা ঘুরে
নিজের বাড়ির মধ্যে ঢুকে করতালি
বাজিয়ে বাবু টের পেলেন যে, রাত-দুপুরে
লুঠ হয়েছে আদ্যোপান্ত গৃহস্থালি।

কিন্তু এখন আদ্যোপান্ত বলতে কি আর
অনেক কিছু বোঝায়? হাতা-খুন্তি-কড়াই-
বালতি-মাদুর-বালিশ, খাঁচার মধ্যে টিয়া,
এবং সে, যে 'চুচ্চু রাধাকৃষ্ণ' পড়ায়।

কোথায় সে? নেই কোথাও। শূন্য ঘর-বারান্দা
ব্যাপার দেখে রাত-দুপুরে অন্ধ গলির
বুকের মধ্যে শিউরে ওঠে। মাঘের ঠাণ্ডা
হাওয়ায় ওড়ে পোকায়-কাটা পত্রাবলী।

কোথায় তুমি? বাবুর সঙ্গে টিয়া চ্যাচায়।
কোটর থেকে পালিয়ে গেছে লক্ষ্মীপ্যাঁচা।

তুমি জানো

কিছুই যে বুঝি না, তা নয়,
কিছু-কিছু বুঝি।
উপরন্তু তুমি তো জানোই,
অন্ধকারে অরণ্যের মর্মে গিয়ে খুঁজি
জোনাকিপোকাও।

গাল টিপলে দুধ বেরোয়, ইদানীং এমন খোকাও
অবশ্য অনেক কথা বলে।
দু-একটা শুনলেই বোঝা যায়,
আমদানি-বাণিজ্য আজ কে চালাচ্ছে কেমন কৌশলে,
এবং কে উঠে যাচ্ছে পর্বতচূড়ায়।

কিছুই যে জানি না, তা নয়,
জানি কিছু-কিছু।
জানি, সিংহাসনত্যাগী সম্রাটের পিছু
নেয় না তস্কর। জানি, সমস্ত দর্পণে আর জলে
মানুষের উলটো-মুখ রয়েছে বসানো।

তুমি সব জানো।
জানো যে, ব্যাধের ওষ্ঠে চুমু খেয়ে উড়ে যায় পাখি।
জানো কী রহস্যে জ্বলে দু-একটা নিষিদ্ধ জোনাকি।

একটিমাত্র

বাকী আছে আর একটিমাত্র চুমা,
কে নিবি রে, কেউ নিবি ?
জ্যোৎস্নার জলে ভাসতে ভাসতে ঘুমায়
কয়েকটা উঁইঢিবি।

মাঠ করে খাঁখাঁ, মাঝখানে আঁকা পথে
যায় না আসে না কেউ,
শুধু ডেকে মরে অতিদূর পর্বতে
গতজন্মের ফেউ।

ছিল গত সনে বৃষ্টি ভুবনে, আর
এইবারে গেল খরা।
যেন বা রতি ও বিচ্ছেদ-ভাবনার
অমোঘ পরম্পরা।

একটিমাত্র প্রণয় রয়েছে ঠোঁটে,
তাই নিয়ে জেগে আছি !
দেখি জ্যোৎস্নায় জানালার কাঁচে ফোটে
শীর্ণ তিনটে মাছি।

অরণ্য-বাংলোয় রাত্রি

নাকারা নাকারা কারা কারা…
ঘুমের গহ্বর থেকে মধ্যরাতে জেগে উঠল পাড়া
অরণ্যের অন্দর-মহলে।
আকাশ নির্মল নয়, কিছু জ্যোৎস্না ছড়াবার ছলে
জলেস্থলে চতুর্গুণ রহস্য ছড়ায়
হলুদ বর্ণের চাঁদ। কে যায়, কে মধ্যরাতে
দ্রুত হাতে
বিপদের সংকেত বাজিয়ে দিয়ে চলে যায়?
সমগ্র সত্তায় খেয়ে নাড়া
উৎকর্ণ অরণ্য শোনে: নাকারা নাকারা কারা কারা…

কিসের বিপদ? আজও অগ্নির বলয় দেখে হটে যেতে যেতে
পর্বতসানুর ভুট্টাক্ষেতে
ফিরে এসেছিল নাকি হাতির দঙ্গল?
অথবা ঝর্ণার জল
খেতে এসেছিল ধূর্ত বাঘ?
জ্যোৎস্না ও আঁধার ষড়যন্ত্র করে ফুটিয়েছে হল্‌দে-কালো দাগ
বাংলোর উঠোনে। রাংচিতের জানলায়
একবার দাঁড়িয়ে ফের ক্ষিপ্র পায়ে কারা নেমে যায়
নীচের জঙ্গলে? সারা
অরণ্যের চিত্তে বাজে: নাকারা নাকারা কারা কারা…

কিছু কি জানাচ্ছে কেউ? কী জানাচ্ছে? পালাও পালাও…
শত্রু আসছে, সরে যাও—
এই কথা? ধূমল আকাশে
কুয়াশায় আচ্ছন্ন সমুদ্রজলে ভাসে
হলুদ বর্ণের চাঁদ। খাদের স্যাঁতসেতে মাটি, পচা ঘাসপাতার জঞ্জাল

পায়ের তলায় চেপে দীর্ঘ শাল
দাঁড়িয়ে রয়েছে স্থির অন্ধকারে। হান্‌টিং পয়েন্‌ট থেকে দেখা যায়,
চল্লিশ মাইল দূরে নিয়নের প্রগল্‌ভ ঝঞ্ঝায়
হাসছে কিরিবুরু, বিশ্বকর্মার শহর।

কিছু স্তব্ধতার পরে বাতাসে আবার শুকনো ডালপালার স্বর
জেগে ওঠে। আবার ঝর্ণার জলধারা
খাদের ভিতরে বুনো খরগোশের পিপাসা মেটায়।
জানি না কে এসেছিল, স্বপ্নের ভিতরে শুধু দোলা দিয়ে যায় :
নাকারা নাকারা কারা কারা…